

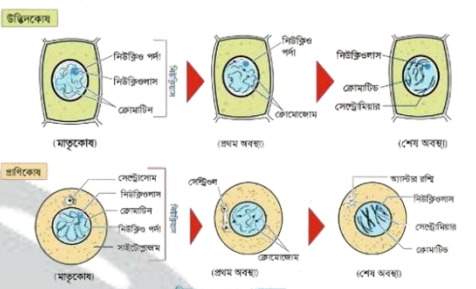


কোষ বিভাজন	<ul style="list-style-type: none"> <li>যে প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষ বিভাজিত হতে দুটি বা চারটি অপত্য কোষ উৎপন্ন করে, তাকে কোষ বিভাজন বলে।</li> </ul>
কোষ বিভাজনের প্রকারভেদ	<ul style="list-style-type: none"> <li>জীবদেহের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া হচ্ছে, মাইটোসিস (Mitosis) এবং মিয়োসিস (Meiosis)।</li> </ul>

### মাইটোসিস

- এই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত বা সুকেন্দ্রিক কোষ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **দুটি অপত্য** কোষে পরিণত হয়।
- মাইটোসিসে নিউক্লিয়াস প্রায় সমানভাবে একবার বিভাজিত হয়। **নিউক্লিয়াসের প্রতিটি ক্রোমোজোমও একবার করে বিভাজিত হয়। মাইটোপ্লাজমও একবারই বিভাজিত হয়।**
- তাই মাইটোসিস বিভাজনে কোষের মাতৃকোষ এবং অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা, তথা **DNA-এর পরিমাণ সমান থাকে।** শুধু যে পরিমাণে একই থাকে তা নয়, মাতৃকোষের **DNA-এর প্রায় হুবহু অনুলিপি** অপত্য কোষে পাওয়া যায়। তাই একে **সমীকরণিক বিভাজনও (Equational division)** বলে।
- এই বিভাজন প্রকৃত নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবের **দেহকোষে** (somatic cell) হয়ে থাকে এবং বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণী ও উদ্ভিদ **দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পায়।**
- প্রাণীর দেহকোষে এবং উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশের ভাজক টিস্যু, যেমন: **কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগ, ভ্রূণমুকুল এবং ভ্রূণমূল, বর্ধনশীল পাতা, মুকুল** ইত্যাদিতে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজন হয়। নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ এবং প্রাণীর **অযৌন জননের** সময়ও এ ধরনের বিভাজন হয়।

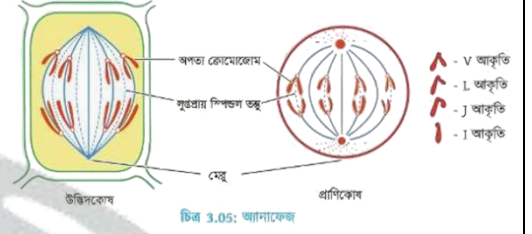
### মাইটোসিসের পর্যায়সমূহ

- বিভাজন শুরুর আগে কোষের নিউক্লিয়াসে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ হয়। এ অবস্থাকে **ইন্টারফেজ** পর্যায় বলে।
- এই বিভাজনে **প্রথমে ক্যারিওকাইনেসিস** অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে এবং **পরবর্তীকালে সাইটোকাইনেসিস** অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ঘটে।
- বর্ণনার সুবিধার জন্য মাইটোসিসের নিউক্লিয়াসের বিভাজন প্রক্রিয়াকে **পাঁচটি পর্যায়ে** ভাগ করা হয়ে থাকে, পর্যায়গুলো হচ্ছে: **প্রোফেজ, প্রো-মেটাফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ এবং টেলোফেজ।**

<p>(a) প্রোফেজ (Prophase)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>এটি মাইটোসিসের <b>প্রথম</b> পর্যায়।</li> <li>এ পর্যায়ে কোষের <b>নিউক্লিয়াস আকারে বড় হয়</b> এবং ক্রোমোজোমগুলো আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে মোটা এবং খাটো হতে শুরু করে।</li> <li>ক্রোমোজোমের এই পরিবর্তনের কারণ হিসেবে পূর্বে পানি বিয়োজনকে বিবেচনা করা হতো, তবে আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে ব্যাপারটি পানির সাথে সম্পর্কহীন অত্যন্ত <b>জটিল প্রক্রিয়া</b>। যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তখন এদের দেখা সম্ভব হয়।</li> <li>এ পর্যায়ে প্রতিটি ক্রোমোজোম <b>সেন্ট্রোমিয়ার ব্যতীত লম্বালম্বি দুভাবে বিভক্ত</b> হয়ে দুটি ক্রোমাটিড উৎপন্ন করে।</li> <li>ক্রোমোজোমগুলো কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকায় এদের সংখ্যা গণনা করা যায় না।</li> </ul>	 <p>চিত্র 3.01-02: প্রোফেজ</p>
<p>(b) প্রো- মেটাফেজ (Pro-metaphase)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>কোষকালের মাইক্রোটবিউল দিয়ে তৈরি স্পিন্ডলযন্ত্রের তন্তুগুলো এক মেরু থেকে অপর মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, এদেরকে <b>স্পিন্ডল তন্তু</b> (spindle fibre) বলা হয়।</li> <li>এ পর্যায়ের একেবারে প্রথম দিকে উদ্ভিদকোষে কতগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সমন্বয়ে দুই মেরু বিশিষ্ট <b>স্পিন্ডল যন্ত্র</b> (spindle apparatus) সৃষ্টি হয়।</li> <li>স্পিন্ডল যন্ত্রের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানকে <b>ইকুয়েটর বা বিষুবীয় অঞ্চল</b> বলা হয়।</li> <li>এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডলযন্ত্রের কিছু নির্দিষ্ট তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। এই তন্তুগুলোকে <b>আকর্ষণ তন্তু</b> (traction fibre) বলা হয়। ক্রোমোজোমের সাথে এই তন্তুগুলি সংযুক্ত বলে এদের <b>ক্রোমোসোমাল তন্তু</b>ও বলা হয়।</li> <li>ক্রোমোজোমগুলো এ সময়ে <b>বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত হতে থাকে</b>।</li> <li>কোষের নিউক্লিয়াসের <b>নিউক্লিয়ার মেমব্রেন ও নিউক্লিওলাসের বিনুপ্তি ঘটতে থাকে</b>।</li> <li><b>প্রাণিকোষে</b> স্পিন্ডল যন্ত্র সৃষ্টি ছাড়াও পূর্বে বিভক্ত সেন্ট্রিওল দুটি দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং সেন্ট্রিওল দুটির চারদিক থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। একে <b>অ্যাস্টার-রে</b> বলে।</li> </ul>	 <p>চিত্র 3.03: প্রো-মেটাফেজ</p>
<p>(c) মেটাফেজ (Metaphase)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>এ পর্যায়ের প্রথমেই সব ক্রোমোজোম স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে (দুই মেরুর মধ্যখানে) অবস্থান করে। এ ঘটনাকে <b>মেটাকাইনেসিস</b> বলা হয়।</li> <li>প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুবীয় অঞ্চলে এবং বাহু দুটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে।</li> <li>এ পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলো <b>সর্বাধিক মোটা এবং খাটো হয়</b>।</li> <li>প্রতিটি ক্রোমোজোমের <b>ক্রোমাটিড দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে</b>।</li> <li>এ পর্যায়ের শেষ দিকে সেন্ট্রোমিয়ারের বিভাজন শুরু হয়।</li> <li><b>নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এবং নিউক্লিওলাসের সম্পূর্ণ বিনুপ্তি</b> ঘটে।</li> </ul>	 <p>চিত্র 3.04: মেটাফেজ</p>

(d) অ্যানাফেজ  
(Anaphase)

- প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, ফলে ক্রোমোটিড দুটি আলাদা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রতিটি ক্রোমোটিডকে **অপত্য ক্রোমোজোম** বলে এবং এতে একটি করে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।
- অপত্য ক্রোমোজোমগুলো বিষুবীয় অঞ্চল থেকে পরস্পর বিপরীত মেরুর দিকে সরে যেতে থাকে। অর্থাৎ ক্রোমোজোমগুলোর অর্ধেক এক মেরুর দিকে এবং বাকি অর্ধেক অন্য মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।
- অপত্য ক্রোমোজোমের মেরু অভিমুখী চলনে **সেন্ট্রোমিয়ার অগ্রগামী থাকে এবং বাহুদ্বয় অনুগামী** হয়।
- সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমগুলো **V, L, J বা I**-এর মতো আকার ধারণ করে। এদেরকে যথাক্রমে **মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক বা টেলোসেন্ট্রিক** বলে।
- অ্যানাফেজ পর্যায়ের শেষের দিকে অপত্য ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল ফাইবারের মেরুপ্রান্তে অবস্থান নেয় এবং ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(e) টেলোফেজ  
(Telophase)

- এটি মাইটোসিসের **শেষ** পর্যায়।
- এখানে প্রোফেজের ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে **বিপরীতভাবে** ঘটে।
- ক্রোমোজোমগুলো আবার সরু ও লম্বা আকার ধারণ করতে থাকে। এর কারণ হিসেবে পূর্বে পানি যোজনকে বিবেচনা করা হতো তবে আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া যা ক্রোমোজোমের পানির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়।
- অবশেষে এরা জড়িয়ে গিয়ে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম গঠন করে।
- নিউক্লিওলাসের পুনরাবির্ভাব ঘটে। নিউক্লিয়ার রেটিকুলামকে ঘিরে পুনরায় নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের সৃষ্টি হয়, ফলে দুই মেরুতে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস গঠিত হয়।
- স্পিন্ডল ফাইবারের কার্ঠামো ভেঙে পড়ে এবং তন্তুগুলো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।



## সাইটোকাইনেসিস

- টেলোফেজ পর্যায়ের শেষে বিষুবীয় তলে **এন্ডোপ্লাজমিক জালিকার** ক্ষুদ্র অংশগুলো জমা হয় এবং পরে এরা মিলিত হয়ে **কোষপ্লেট** গঠন করে। সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুসমূহের সমবন্টন ঘটে। ফলে দুটি অপত্য কোষ (daughter cell) সৃষ্টি হয়।
- প্রাণীর ক্ষেত্রে স্পিন্ডল ফাইবারের বিষুবীয় অঞ্চল বরাবর কোষঝিল্লিটি গর্তের মতো ভিতরের দিকে টুকে যায় এবং এ গর্ত সবদিক থেকে ক্রমান্বয়ে গভীরতর হয়ে একত্রে মিলিত হয়, ফলে কোষটি দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ে।

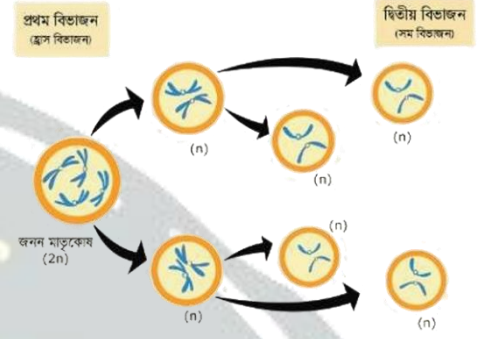


## মাইটোসিসের গুরুত্ব

- জীবদেহে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যকার আয়তন ও পরিমাণগত ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এর ফলে বহুকোষী জীবের **দৈহিক বৃদ্ধি** ঘটে। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গুণাগুণ একই রকম থাকায় জীবের দেহের বৃদ্ধি সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে।
- সব বহুকোষী জীবই জাইগোট নামক একটি কোষ থেকে জীবন শুরু করে। এই একটি কোষই বারবার মাইটোসিস বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে **পূর্ণ জীব পরিণত** হয়।
- মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় **বংশবৃদ্ধি** ঘটে, মাইটোসিসের ফলে **অঙ্গজ প্রজনন** সাধিত হয় এবং **জননকোষের সংখ্যাবৃদ্ধিতে** মাইটোসিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- **অযৌন জননের** জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন অপরিহার্য।
- **ক্ষতস্থানে** নতুন কোষ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবদেহের ক্ষতস্থান পূরণ করতে মাইটোসিস অপরিহার্য। কিছু কিছু জীবকোষ আছে যাদের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। এসব কোষ বিনষ্ট হলে মাইটোসিসের মাধ্যমে এদের পূরণ ঘটে।
- মাইটোসিসের ফলে একই ধরনের কোষের উৎপত্তি হওয়ায় জীবজগতের **গুণগত বৈশিষ্ট্যের স্থিতিশীলতা** বজায় থাকে।
- তবে **অনিয়ন্ত্রিত মাইটোসিস** টিউমার এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।
- **টিউমার ও ক্যান্সার** এগুলো অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফল। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোনো কারণে এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয় এবং প্রাণঘাতী টিউমারকে ক্যান্সার বলে।
- গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু, রাসায়নিক পদার্থ কিংবা তেজস্ক্রিয়তা ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। সহস্রাধিক জিনকে ক্যান্সার কোষ তৈরিতে সহায়ক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।
- উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যায়, *হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের* E6 এবং E7 নামের দুটি জিন এমন কিছু প্রোটিন সৃষ্টি করে, যা কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রক প্রোটিন অণুসমূহকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে কোষ বিভাজনের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে যায় এবং সৃষ্টি হয় জরায়ুমুখের টিউমার। অনেক সময় এ দুটি জিন পোষক কোষের জিনের সাথে একীভূত হয়ে যায় এবং কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী প্রোটিন অণুগুলোর কাজ বন্ধ করে দেয়। সৃষ্টি হয় ক্যান্সার কোষ, কিংবা ক্যান্সার।
- অনেক ধরনের ক্যান্সার রয়েছে এবং সেগুলো সবই কমবেশি মারাত্মক রোগ। লিভার, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, স্তন, স্বক, কোলন এবং জরায়ু, অর্থাৎ দেহের প্রায় সকল অঙ্গেই ক্যান্সার হতে পারে।

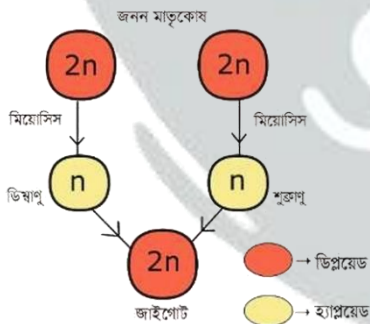
## মিয়োসিস (Meiosis)

- মিয়োসিস বিভাজনের সময় একটি কোষ পর পর দুবার বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনকে প্রথম মিয়োটিক বিভাজন বা **মিয়োসিস-1** এবং দ্বিতীয় বিভাজনকে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন বা **মিয়োসিস-2** বলা হয়। প্রথম বিভাজনের সময় অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেকে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিভাজনটি মাইটোসিসের অনুরূপ, অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না।



চিত্র 3.09: মিয়োসিস বিভাজন সহজতর ধারণা

- তাই সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ফল হলো, মিয়োসিস বিভাজনে একটি মাতৃকোষ থেকে **চারটি অপত্য কোষ** পাওয়া যায়, যেগুলোর প্রতিটিই মাতৃকোষের অর্ধেকসংখ্যক ক্রোমোজোম ধারণ করে (কাজেই DNA-এর পরিমাণও হয় প্রায় অর্ধেক)। তাই মিয়োসিসের আরেক নাম **হ্রাসমূলক বিভাজন** (Reductional division)।
- মিয়োসিস প্রধানত জীবের জনন কোষ বা গ্যামেট সৃষ্টির সময় **জনন মাতৃকোষে ঘটে। সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগধানী ও ডিম্বকের মধ্যে এবং উন্নত প্রাণিদেহের শুক্রাশয়ে ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে** মিয়োসিস ঘটে। ছত্রাক, শৈবাল ও মসজাতীয় হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদের ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে যখন হ্যাপ্লয়েড রেণু উৎপন্ন হয়, তখন জাইগোটে এ ধরনের বিভাজন ঘটে।
- মিয়োসিস কেন হয়? যৌন জননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলনের প্রয়োজন হয়। যদি জনন কোষগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের সমান থেকে যায় তা হলে জাইগোট কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা জীবটির দেহকোষের দ্বিগুণ হয়ে যাবে।  
যদি প্রতিটি জীবের জীবনচক্র এভাবে চলতে থাকে তাহলে প্রতি চক্রে যৌন জননের ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা বারবার দ্বিগুণ হতে থাকবে। আমরা জানি, ক্রোমোজোম জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিন বহন করে। কাজেই ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হতে থাকলে বংশধরদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে।



চিত্র 3.10: কোষ বিভাজনের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টি

- যেহেতু পুং ও স্ত্রী জনন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা অর্ধেক, তাই জীবের যৌনজননে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের মিলন হয়ে জাইগোটে পূর্ণসংখ্যক ক্রোমোজোম পাওয়া যায়। এভাবে জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা বংশপরম্পরায় একই থাকে। জনন কোষ সৃষ্টির সময় এবং নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদের জীবনচক্রের কোনো এক সময় যখন এ রকম ঘটে, তখন কোষের অর্ধেক ক্রোমোজোম সংখ্যার সে অবস্থাকে **হ্যাপ্লয়েড** (n) বলে। যখন দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষের মিলন ঘটে, তখন সে অবস্থাকে **ডিপ্লয়েড** (2n) বলে। অর্থাৎ **মিয়োসিস কোষ বিভাজন হয় বলেই প্রতিটি প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় টিকে থাকতে পারে।**

- বাস্তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে। যেমন: ব্যাঙের একটি প্রজাতি *Xenopus tropicalis*-এর সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম সেট দ্বিগুণ হয়ে *Xenopus laevis* প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে। প্ল্যান্টি রাজ্যের বিভিন্ন সদস্যের (যেমন: আলু) দেহকোষে (জননকোষে নয়) এই প্রক্রিয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক সময় আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করার জন্য উদ্ভিদের এই জাত বেছে নিই, এমনকি সেরকম জাত পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করি, কারণ তা আকারে তুলনামূলকভাবে বড় হয়। এসব জাত খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অধিকতর সহায়ক।
- ক্রোমোজোম বা জেনেটিক বস্তুর সমতা রক্ষা করা ছাড়াও **জীনগত বৈচিত্র্য** বজায় রাখা মিয়োসিসের একইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান। যৌন জনন করে এমন সকল জীবে মিয়োসিসের মাধ্যমে জিনের পুনর্বিন্যাস হয়ে জীনগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনো প্রজাতির টিকে থাকা বা না থাকা মূলত নির্ভর করে তার সদস্য জীবদের মধ্যে কতটা বৈচিত্র্য আছে, তার উপর।
- পরিবেশ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। সেইসব প্রজাতি টিকে থাকে, যাদের অন্তত কিছু সদস্যের মধ্যে সেই পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদি কোনো প্রজাতির জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য কম থাকে, তাহলে নতুন কোনো পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মতো বৈশিষ্ট্য কারোর মধ্যে থাকার সম্ভাবনাও হবে কম। ফলে হয়তো পুরো প্রজাতিটাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোনো প্রজাতির জীবদের মধ্যে বৈচিত্র্য বেশি থাকে, তাহলে নতুন কোনো পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মতো বৈশিষ্ট্য কারো না কারো মধ্যে থাকার সম্ভাবনাও হবে বেশি। তখন যদি বড় কোনো বিপদও আসে, তবু তার অন্তত কিছু সদস্য বেঁচে যাবে। তাই মিয়োসিস কোনো জীবের জীনগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে প্রজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
- জীবের টিকে থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয় বলেই মিয়োসিস বিভাজন বিবর্তিত হয়ে জীবজগতে নিজের স্থান করে নিয়েছে।



চিত্র 3.11: বৃহৎ প্রজাতি *Xenopus tropicalis* (নিচে) এবং *Xenopus laevis* (উপরে)